শান্তিনিকেতন-শালবীথিকায়

বনবাণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
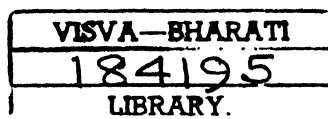
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুন্‌গুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা; ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়! তার মানে, গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তা হলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন তাঁর বাণীর সঙ্গে

সঙ্গে সেই বোধিক্রমের বাণীও শুনি যেন— দুইয়ে মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। শুনেছিলেন : যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি, সেই বেগ থামতে চায় না— রূপের ঝর্না অহরহ ঝরতে লাগল ; তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানলার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি, শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দরূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়, প্রথমপ্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয়, তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়— তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ— অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম

তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে— তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝর্না আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে, স্নিগ্ধ হয়ে, তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ— আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

[হোটেল ইম্‌পীরিয়ল]
ভিয়েনা
২৩ অক্টোবর ১৯২৬

সূচীপত্র

বনবাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ ;
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা ·
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।

সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্তের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

বনবাণী

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর-উৎসবমন্ত্র-হীন—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্তপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

বনবাণী

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে,
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ; দুশ্চিন্তার গুরুভারে
নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ ধরণীর, বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যামস্নিগ্ধরূপ ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী ; দিলে তারে পরম সম্মান ;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী— সে অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

[শান্তিনিকেতন]
৯ চৈত্র ১৩৩৩

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

-প্রিয়করকমলে

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল, ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ, মানুষের পদশব্দ-তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে।
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারি ভিতে
তৃণে তৃণে, বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে—
কাছে থেকে শুনি নাই; হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে; অরণ্যের অন্তরবেদনা

শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগালো স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্ত-মাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর-সাথে মানবমর্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদি
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্তের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে

হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ কূলে, ও কূলে ; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান ; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্দ্র তোমার আপন কর্ম-মাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা ;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা,
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন-তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৪৫

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন—কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো; ওই দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী— তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে বাণী ধরিল শ্যামকায়া; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।
ঋজু দীর্ঘ দেবদারু— গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা-চেয়ে; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ,
ঊর্ধ্ব-পানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

শিলঙ
২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

আম্রবন

সে বৎসর শান্তিনিকেতন-আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউ বা চিত্রে কেউ বা কারুশিল্পে কেউ বা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সেদিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন— সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্ণে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌচেছিল, আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্ণের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজালো আজি
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি—
চিনি তারে কিম্বা নাহি চিনি
কে জানে কেমন!
অন্তরে অন্তরে তব যে চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা
মঞ্জরীতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা—
অজানারে খুঁজি
আমারি মতন আন্দোলন।

বনবাণী

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি

সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে

ওগো আম্রবন।

আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি

অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে

অমনি নূতন।

প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়

অদৃশ্যের নিশ্বসিত ধ্বনি,

ওগো আম্রবন।

আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,

নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়

সুরের গাঁথনি—

গীতঝংকারের আবরণ।

যে অজস্রভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি

ভূতলের চিরন্তনী কথা,

ওগো আম্রবন,

তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,

ধরণীর বিরহবারতা

গভীর গোপন।

সে ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,

মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে

ওগো আম্রবন।

আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে,

মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে

স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত
ওগো আম্রবন।
যেন নাম ধ'রে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ-সনে
জনম-মরণ-পরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউলপ্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য-আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতিক্ষণে
দীপ জ্বালি তার
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনার
আকুলিত অলকসজ্জায়
জোগালে ভূষণ।
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,

বনবাণী

ওগো আম্রবন,
সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির—
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।

[শান্তিনিকেতন]
৫ ফাল্গুন ১৩৩৪

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন-উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেক কাল অপেক্ষার পরে নীল ফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত, কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সেদিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরীর গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা।

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া।

বনবাণী

যে মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক্ কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে, আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরীর পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকুতি।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে—
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে—
কত ফাল্গুনের কত শ্রাবণের আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা।

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখি-জলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকার সুরে মাখা,
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা।

বনবাণী

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে—
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে।

'কেন এ কে জানে' এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে,
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে—
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি, কেন এ কে জানে।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'।

অভ্যাসের-সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,

বনবাণী

হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে—
বিশ্ব-পানে চাহিলাম, কহিলাম 'কেন এ কে জানে'।

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা-মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে—
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

ভরতপুর
১৭ চৈত্র ১৩৩৩

কুর্‌চি

অনেক কাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশন-ঘরের পিছনের দেয়াল-ঘেঁষা এক কুর্‌চি গাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারি দিকে হাট বাজার; এক দিকে রেলের লাইন, অন্য দিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্ল্যু. ডি র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুর্‌চি গাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে— উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুর্‌চির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়, ছিল প্রীতি কুমুদিনী-পানে।
সহসা বিদেশে আসি, হায়, আজ কি ও কুটজেও বহু বলি মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ ॥

কুর্‌চি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে ভ্রমর, শুনি নাকি, তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা
তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।

বনবাণী

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে জনতার নিত্যকলরবে,
ইঁট-কাঠ-পাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে। সূর্য-পানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে ; সহসা পড়েছে যেন মনে,
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে
পারিজাতমঞ্জরীর লীলার সঙ্গিনীরূপ ধরি
চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী ;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে ; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিঃশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে।
অদূরে কঙ্কররুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয় রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে ; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমা-পানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধকিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে— অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,
ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহনগীতে
প্রণমিয়া, উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে, পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে নাম হয় নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর। সে নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ; সে সুরে গোপন বার্তা জানি
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি ব'লে, ছন্দ তোরে করে পরিহার—
তা ব'লে হবে কি ক্ষুণ্ন কিছুমাত্র তোর শুচিতার।
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি—
কুর্‌চি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

শান্তিনিকেতন
১০ বৈশাখ ১৩৩৪

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সে দিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব, কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি, তেমনি ওই শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা, যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত, দিশি দিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ, কোকিলের গান অহর্নিশি
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্ধ্বশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ী বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;

সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিলে ধরি সূর্যলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে ; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি— বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান
পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল ঊর্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহাশাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসংগীতে
মঞ্জরীর গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি-পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি ;
মর্তপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা জপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চলে-যাওয়া দল

বনবাণী

রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণহাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের-আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে-অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার-রঙে-রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সে দিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।
গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সে দিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবনপ্রবাহ
আনন্দচঞ্চলগতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্রদোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্তের বেদনা মেশে।

বনবাণী

চাহি আজ দূর-পানে
স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে— ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোলপূর্ণিমায় সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পনলেখা এঁকে দিতে
তব ছায়াবেদিকায়, বসন্তের আবাহনগীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষন। সে উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার পড়ে আছে এ রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে গাঁথা মালা
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন ;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল ; সে দিন এ দিন
দোঁহে দোঁহা-মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

[শান্তিনিকেতন]
৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

মধুমঞ্জরী

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে— জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরে যে দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এ দেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশি নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি, মরি,
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
        মধুমঞ্জরীলতা।
কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে—
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
        কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলিকালে,
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
        কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া, জড়িত ডালের ফাঁকে

বনবাণী

কালপুরুষের ইঙ্গিত যেন কাকে
দূর দিগন্তকোণে।

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর,
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর—
মনে হয়, ওর হিয়া যেন ভরভর
বিশ্বের বেদনাতে।
কতবার ওর মর্মে গিয়েছি চলি,
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি
শরৎশিশিরে যখন সে ঝলমলি
শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি।
কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ওই জানে,
মন তা জানিবে কিসে।

বনবাণী

যে ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত,
ধরিতে না পারে তারে।
ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের-মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি,
মোর আঁখি-পানে চেয়েছিল দুলি দুলি
করুণপ্রশ্নরতা।
তার পরে কবে দাঁড়ালো যে দিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন ক'রে—
মধুমঞ্জরীলতা।

তার পরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,

তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।
বরষে বরষে সেদিনও তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্যঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।
অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে—
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্‌মূলে,
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরীলতা।

[শান্তিনিকেতন]
চৈত্র ১৩৩৩

নারিকেল

সমুদ্রের ধারের জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে— সে নিঃসঙ্গ, নিষ্ফল, নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয়, সে যেন প্রাণপণে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না , সেই উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে উঠে তার যে সন্ধান-দৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্দ্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণসমুদ্র থেকে তার তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্রডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লবমর্মরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূরবন্ধুর বার্তা পেল, যে বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরু করেছিল? সেই যুগারম্ভপ্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে স্পর্শপুলক জেগেছিল তাই আজ ফিরে পেয়ে কি ওই গাছটির সম্বৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ওই নব-উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে বাণী বলছে— 'চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।'

বনবাণী

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব, নারিকেল— দিনরাত্রি কাটে
যে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে
তাই তো শিকড় উপবাসী, কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
লম্বিত শাখায় তব।

ওই শুন, উঠিয়াছে ডাকি
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
দক্ষিণপবন হতে, যে বাণী সমুদ্র শুধু জানে—
পৃথিবীর কূলে কূলে যে বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতি ক্ষণে
অশান্ততরঙ্গমন্দ্রে, দক্ষিণসাগর হতে একি
তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত।

রুদ্রডমরুর জাগরণী
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
কান পেতে ছিলে তুমি— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি

বনবাণী

সুদূরবন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি—
যে বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্ষ সেই
যুগারম্ভ প্রভাতের আদি-উৎসবের নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে যে আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

[শান্তিনিকেতন]
১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

চামেলিবিতান

চামেলিবিতানের নীচের ছায়ায় আমি বসতুম— ময়ূর এসে বসত উপরে লতার আশ্রয়বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরো তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল, কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম, আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি, অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হওয়াতে, পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এ যুগের কবি পুনরায় প্রচার না ক'রে থাকতে পারল না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর, কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে—
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।

লিখিতেছি নিজ মনে—
হেরি তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি।
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোনো খেদ নাই।
তবু আমি খুশী আছি
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস।
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।
সুন্দরের দূত তুমি,
এ ধূলির মর্তভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন—
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধ'রে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান।

কাননের এই এক কোণা,
হেথায় তোমার আনাগোনা।

বনবাণী

চামেলিবিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আস কী যে ভাবি,
মোর চেয়ে তোর দাবি
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কচি পাতা যে বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীতচিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল-সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।
ধরায় যেখানে তাই
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।

সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব লাগে,
মোরে তুমি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই-যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে আগ্নেয়বাণ
মুহূর্তে অমূল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।

বনবাণী

যে বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
 সে বসন্ত নহে তার তরে।
ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
 অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
 কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
 পুণ্য পৃথিবীর শিরে—
তার লজ্জা তুই কি রে
 আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা,
সৌন্দর্যেরে দেয় ব্যথা
 কেন যে তা বুঝিবি কেমনে।
কেন যে কদর্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
 বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে হস্ত দানেরই তরে
তারি রক্তপাত করে,
 সেই লজ্জা নিখিলজনার।

[শান্তিনিকেতন
বৈশাখ ১৩৩৪]

পরদেশী

পিয়র্সন কয়েক-জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি, কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিম্বা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশু-পাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা সুরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে নি।

এনেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জ-মাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

•

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বন-জামেরে চঞ্চু তার
অচেনা বলে দোষী না করে।

বনবাণী

শরতে যবে শিশিরবায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলিবীথি,
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।
শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালি লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে ফুল তার হৃদয় হরে।

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস ব'লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চির-জানারই লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

[শান্তিনিকেতন]
৮ বৈশাখ ১৩৩৪

কুটিরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তাল গাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লীরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি,
উঠেছে হাসি—
উদাসী বিবাগীর
চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।

বনবাণী

ঘাসের কাঁপা লাগে,
পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে
তুফান-তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুন্‌গুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিরবে
জাল-বুনানি।

দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,
পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি
জানে তা কেবা—
ফুলের গাছে তব
স্নেহের সেবা।
এ কথা কারো মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি।

দিনের পরে দিন
যে দান আনে
তোমার মন তারে
দেখিতে জানে।

বনবাণী

নম্র তুমি, তাই
সরলচিতে
সবার কাছে কিছু
পেরেছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাও নি ফাঁকি।

চাও নি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পারো।
তোমার ঘরে আসে
পথিকজন—
চাহে না জ্ঞান তারা,
চাহে না ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমনধারা
তোমারি আসনের
শরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পুকুর-পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।

বনবাণী

তোমারো কথা নাই,
তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে
সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে।

তোমারি মতো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে
তালের গাছে
বিরল পাতাক'টি
আলোয় নাচে।
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধু ধু,
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।

বনবাণী

দেখি যে পথিকের
মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার
সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো—
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত।

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিজালে-ঘেরা
আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল
আমারো দাবি—
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

[শান্তিনিকেতন
চৈত্র ১৩৩৩]

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যাল্‌হৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরোতুম, অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজও মনে আছে, এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম-দেখা ঝরনার রহস্য আমার মনকে প্রবল কবে টেনেছিল। এ দিকে ডান পাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না— কেবলই ভাবি, এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ্য কেন হয়। সেই ঝরনা কোন্‌ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে, কিন্তু সেই মুহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয়-গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে,
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারে বারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন, বর্ণনাবিহীন।

সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ; মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

বনবাণী

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার ;
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুকচরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে ; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি,
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন-বাধায়-কীর্ণ শঙ্কায়-সংকুল পথ-মাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে, কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্তপ্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

বনবাণী

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত, অশ্রান্ত, অজেয়।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩৪

—

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

ভূমিকা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি -যোগে 'নটরাজ' দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তি-নিকেতনে অভিনীত হয়েছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তাঁর অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস-উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। 'নটরাজ' পালা-গানের এই মর্ম।

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা। ১৩৩৪

মুক্তিতত্ত্ব

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?
হায় রে মিছে, হায় রে মিছে।

মুক্ত যিনি দেখ্-না তাঁরে,
আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়
হলদে রঙে লেখেন তিনি।

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তিকুলের।
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তিরাশির বিকিকিনি।

এই নেমেছে চাঁদের হাসি,
এইখানে আয় মিলবি আসি,
বীণার তারে তারণমন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন-খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপ্‌নাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপ্‌নাতে যার আপ্‌নি আছে।

বনবাণী

যে নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

শুনবি রে আয় কবির কাছে—
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।

রবির মুক্তি দেখ্‌-না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার।
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তিদোলের শুক্লরাতে,
জ্বললো আলো, বাজল মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে।

উদ্‌বোধন

মন্দিরার মন্ত্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।

মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গি, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে— যে নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশস্পদল,
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কাল-পানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে—
যে নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্‌ বাধা,
বন্ধ্যতার অন্ধ দুঃশাসন, শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে— যে নৃত্য-আঘাতে,

বনবাণী

বহ্নিবাষ্পসরোবরে উর্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্তবক্ষে গ্রহনক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল, ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদপাত
তোমার ডম্বরুতালে, পূজানৃত্য করি দেয় সারা
সূর্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।

নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দোবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি।
সর্ব অমঙ্গলসর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।

প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু—
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরুদুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণবায়ুর আলিঙ্গনে,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, আম্রমঞ্জরীর সর্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়। অবসাদে যেন অন্যমনে

নটরাজ

তালভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি উৎসারিত করে দিক গান।
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হতে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যছন্দোমন্দাকিনীধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
 ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
 মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার চরণপবনপরশে
সরস্বতীর মানসসরসে
 যুগে যুগে কালে কালে
 সুরে সুরে তালে তালে
ঢেউ তুলে দাও, মাতিয়ে জাগাও
 অমলকমলগন্ধ হে।
 'নমো নমো নমো—
 তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
 ভরুক চিত্ত মম।'

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
 নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
 কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়
 যুগে যুগে কালে কালে
 সুরে সুরে তালে তালে—

নটরাজ

অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।

'নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

'নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

মোর সংসারে তাণ্ডব তব
কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘুর্ণিতালে।

বনবাণী

ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে
জীবনমরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।

'নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।'

ঋতুনৃত্য

বৈশাখ

ধ্যাননিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত
নিঃস্ব গগনে বিশ্বভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারি ধার করে হাহাকার,
ধরাভাণ্ডার রিক্ত।

তব তপতাপে হেরো সবে কাঁপে,
দেবলোক হল ক্লান্ত!
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।
দুর্দিনে আনে নির্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু—
ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য।

জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে,
তাপস, লোচন মেলো হে—
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।

বনবাণী

জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাসহারা উদাস পরানে
জাগাও উদার নৃত্য।

ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।
কদর্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।
পিনাকে তোমার দাও টংকার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,
ধুলায় মিশাক যা কিছু ধুলার—
জয়ী হোক যাহা নিত্য।

বৈশাখ-আবাহন

গান

এসো, এসো, এসো, হে বৈশাখ।
তাপস, নিশ্বাসবায়ে
মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা
দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি,
যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

মুছে যাক সব গ্লানি,
ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে
শুচি হোক ধরা।
রসের আবেশরাশি
শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব
প্রলয়ের শাখ—
মায়ার কুজ্ঝটিজাল
যাক দূরে যাক।

বৈশাখের প্রবেশ

গান

নমো নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।
নমো, নমো, হে বৈরাগী।

সম্বোধন

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন, হে নির্বাক্,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,
ভাণ্ডারে তার কাঁপিল ভিত্তি,
শঙ্কায় তার শুকায় তালু,
অট্ট হাসিল মরুর বালু।

হুংকার সেই তপ্ত হাওয়ায়
প্রান্তর হতে প্রান্তরে ধায়,
দিগ্বধূদের নীরবে কাঁদায়,
শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি
বিজয়পতাকা আকাশে তুলি।

নটরাজ

দুহিয়া লয়েছ গগনধেনুরে,
ঝরায়ে দিয়েছ শিরীষরেণুরে,
উদাস করেছ রাখালবেণুরে
তৃষ্ণাকরুণ সারঙ তানে।

শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,
ঝিরিঝিরি জল ধীরিধীরি বয়,
আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলিগানে।

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন হে নির্বাক্,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

গান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর
বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ-ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধনধন
চরম সর্বনাশে।

বাতাসে তোর সুর ছিল না,
ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর
শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথি
বিপুল অট্টহাসে।

কালবৈশাখী

ডাক বৈশাখ, কালবৈশাখী,
করো তারে লীলাসঙ্গিনী—
কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী,
আসুক প্রলয়রঙ্গিণী।
হৃতনিশ্বাস অম্বরতলে
রুদ্ধ বাতাস তাপশৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক্ ঝংকার
অন্তর তব চঞ্চলি,
মন্থি আনুক মর্তস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি।

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরুগুরু মেঘ মন্দ্রিয়া—
দিগ্বধূ যত হাহাকাররবে
দুর্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।
গৈরিক তব জয়পতাকায়
সন্ধ্যারবির রঙ সে মাখায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তালতমালের খঞ্জনি।
সপ্ততারার লুপ্তির ’পরে
নাচে সে সুপ্তিভঞ্জনী।

তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তর্জিয়া,

তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জিয়া।
দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—
বাজিয়া উঠিবে কলকল্লোল
বনপল্লবে-পল্লবে—
শ্যাম উত্তরী নির্মল করি
সাজাবে আপন বল্লভে।

মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।
শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি,
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী।

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

বনবাণী

পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পুরবকূলে বকুলবীথি-মাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমলনীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে,
রাগিণী তার তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে খেলা ভুলি
পথে তাহারে ছায়া দিবারই লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে।
কপোত দুটি তাহারি সাড়া পেয়ে
চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,
মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন-মাঝে তাহারি বাণী মাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

নটরাজ

কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হয়ে রয়েছ দিনে রাতে।
নীরস কাঠে আগুন তুমি জ্বাল,
আঁধার যাহা করিবে তারে আলো—
অশুচি যাহা যা-কিছু আছে কালো
দহিবে তারে, সুদূরে যাবে ভাগি।
মাধুরীধ্যান পরানে তব জাগি।

ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস—
এই-যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনি,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দগুঞ্জরিত ধ্বনি ?
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাঙ্গ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্বশূন্য গহনে বৈরাগী
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে
জীর্ণ পর্ণশয্যা-'পরে একা রহে জাগি
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি।

তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা—
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে।
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্‌বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে,
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চকম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে···
মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখীসন্ধ্যা-ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্‌বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য-কঠোর বন্ধন।

বর্ষার প্রবেশ

গান

নমো, নমো, করুণাঘন নমো হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে।

'ঐ কি এলে আকাশপারে
দিক্-ললনার প্রিয়,
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়।'

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণজলে,
তিমিরমেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল
নিবিড় হর্ষণে।

বনবাণী

'মেঘের মাঝে মৃদঙ তোমার
বাজিয়ে দিলে কি ও
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।'

ভরুক গগন, ভরুক কানন,
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলনস্বপন
মধুর-বেদন-ভরা।
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির-আকাশ করুক আড়াল—
নয়ন ভুলুক, বিজুলি ঝলুক
পরম দর্শনে।

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে।
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশুধূসর,
ধ্যান-অঙ্গন শুষ্ক ঊষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী।
বুঝি আসন্ন হল তার বর,
শুনি গর্জন রথঘর্ঘর,
বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত,
তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল,
আঁখিপল্লব বাষ্পসজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।

ওগো বিরহিণী, গেল দুর্দিন,
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্পচয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে।
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি।
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।

ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুমচন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার,
কবরী রচিয়া এলোকেশভার
বেঁধে তোলো বেণীবন্ধনে।

উঠ ধূলি হতে, ওগো দুঃখিনী,
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহো লহো টানি,
হাসিমুখে চাহ সুন্দরী।
বীরমঙ্গল ঘোষুক মন্ত্র,
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুকসুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি উঠুক
তব চঞ্চল কঙ্কণে।
কুঞ্জকানন জাগ্রত হোক
আজি বন্দনাসংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গিতে।

শ্যামবন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।

নটরাজ

রাখিবি দুয়ারে আল্‌পনা আঁকি,
চরণের তলে ধুলা দিবি ঢাকি
টগর করবী রঙ্গণে।
গাও জয় জয়, গাও জয়গান,
ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে—
বনপথে আসে মনোরঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম-অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।
জটার গভীরে লুকালে রবিরে,
ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব।

বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি
গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশালো—
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো।
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব।

বর্ষামঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনালো মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতালো তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহদীপনদীপিকা
পাঠালো তোমারে এ কোন লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরুধূপের গন্ধ।
শিখিপুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন-ছন্দ ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছলছলে,
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ—

স্খলিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত ?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরুতলে-তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচনশিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত।

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি
ঝরঝর ধারাজলে
তমালবনের শ্যামল তিমিরতলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা।
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।
কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি
আতুর নয়নে দু হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি,
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।

নটরাজ

যাক যাক তব মন গলে গলে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক,
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখদুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমতো তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি—
আজ, সন্ন্যাসী, কাজ নাই জপে জাপে।

শ্রাবণবিদায়

গান

শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে।
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর।
শরৎ বলে, যাক-না সময়, ভয় কিবা তার—
কাটবে বেলা আকাশ-মাঝে
বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন,
ও যে হল সাথিহীন।
পুব-হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো।
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো—
সাজবে বাদল আকাশ-মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।

নটরাজ

যায় রে শ্রাবণকবি রসবর্ষা ক্ষান্ত করি তার—
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি দিল। জানি, রেখে গেল তার দান
বনের মর্মের মাঝে ; দিয়ে গেল অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে ; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ-অমৃতে ;
সলিলগণ্ডুষ দিতে তটিনী সাগরতীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তারি ; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে
রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল ; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান
কালবৈশাখীর তরে ; নিজ হস্তে সর্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল। আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ।

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা।
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা

'যাত্রাবেলায় রুদ্ররবে
বন্ধনডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে।'

নয়ন কিসের প্রতীক্ষারত
বিদায়বিষাদে উদাস-মতো,
ঘনকুন্তলভার ললাটে নত—
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।

'মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে।
যাই চলে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে।'

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে
মর্মর মুখরিল মৃদু পবনে,
বর্ষণহর্ষ-ভরা ধরণীর
বিরহবিশঙ্কিত করুণ কথা।
ধৈর্য মানো, ওগো, ধৈর্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয় নি ম্লান,
আজো হয় নি ম্লান,
ফুলগন্ধনিবেদনবেদনসুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।

নটরাজ

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরীপ্রান্ত
উত্তরপবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মরছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা।
আজি মেঘ বর্ষণরিক্ত,
নিঃশেষবিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা।

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশবাণীর বীন,
শিশির-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে।
আয় সুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাট জয়যাত্রার তিলকে।
গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তার—
বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে।

শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা—
বলে, 'চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো-সে।
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি চলো সে রুদ্ধ ঘরে—
লও কার্মুক, দানবের বুকে হানো-সে।'

ওরে, শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীরগৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে—
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।

নটরাজ

'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি
দেবসেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী'—
এই মহাবর চরণে তাঁহার মাগো রে।

আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লানমনে নমো রে।
স্বর্গের রাখী বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।
মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস—
'হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।'

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায়রজনীতে—
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে।
গগনে তার মেঘদুয়ার ঝেঁপে
বুকেরই ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে।

শীতল হোক বিমল হোক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলালো,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে-ভরা শিউলি-ঝরা গীতে।

শরতের প্রবেশ

গান

নির্মল কান্ত, নমো হে নমো।
স্নিগ্ধ সুশান্ত, নমো হে নমো।
বন-অঙ্গনময় রবিকররেখা
লেপিল আলিম্পনলিপিলেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমো।

—

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-ভোলানো সুরে—
চপল করে হাঁসের দুটি পাখা,
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলিকুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অমনি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধুলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।
অলস মেঘ যায়-যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।

বনবাণী

নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে,
কী নেশা আজি লাগালো তার জলে,
ধানের বনে বাতাস কী যে বলে,
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি,
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।
কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্মরিত গীতে—
ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিকবন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
        কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।

        'সেই তো তোমার পথের বঁধু
            সেই তো।
        দূর কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু
            এই তো।'

আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হল পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
        সেই জুটালে।

        'সেই তো তোমার পথের বঁধু
            সেই তো।
        এই আলো তার এই তো আঁধার
            এই আছে এই নেই তো।'

শরৎ-বাণীর বীণা বাজে
        কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
        শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ খেতে,
বনের প্রাণে মর্‌মরানির
        ঢেউ উঠালে।

শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা—
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয়-মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি-ভরা—
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়ম্লান ধরা।
জানি নে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন সব ঢেলে দেয়, শেষ খেলা তার খেলে।
না হতে প্রহরশেষ
হবে কি নিরুদ্দেশ—
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।
এই তব আসা-যাওয়া
এ কি খেয়ালের হাওয়া—
মিলনপুলক তাতেও কি অবহেলা।
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কি কেবলই খেলা।

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল।
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হলি ব্যাকুল

কেন রে তুই উন্মনা—
নয়নে তোর হিমকণা ?
কোন্ ভাষায় চাস বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল।

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব
 যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি
 আপনি ঘুচালে কি।
ছিল তো শেফালিকা
তোমারি লিপি-লিখা,
তারে যে তৃণতলে
 আজিকে লীন দেখি।

কাশের শিখা যত
 কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে
 পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে আলোকে
অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো
 মরণে যাবে ঠেকি।

হেমন্তের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, নমো।
তুমি ক্ষুধার্তজনশরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগধন্য
করো অন্তর মম।

—

হেমন্তেরে বিভল করে কিসে,
চলিতে পথে হারালো কেন দিশে।
যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি—
কণ্ঠ তাই হারালো তার বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন-অনিমিষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে।

ক্ষণেকতরে লও-না ঘরে ডাকি,
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি।
ক্ষণেকতরে লও-না ঘরে ডাকি।

বনবাণী

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শ্যাওলা-ঝোলা তিমিরগুহাতলে।
যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে।

চলিতে পথে এল আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুরদলে গগনে রচে কারা,
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলিজাল পাতি।
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি॥

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বাল
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তারে বাঁচায়ো দয়াদানে,
কল্যাণী গো, তোদেরই কল্যাণে
ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো—
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।

গান

শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই
শীতের বনে,
এলে যে সেই শূন্য খনে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্য খনে।

দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে।

বনবাণী

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার
নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি
ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন
করুণ বাষ্পে মাখা।

ধরার আঁচল ভরে দিলে
প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ
পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে,
আপ্‌নাকে এই কেমন তোমার
গোপন করে রাখা।

হেমন্ত

হে হেমন্তলক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান।
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল করে আন
কুয়াশায়। কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে-মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে। দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি
ওই হেরো রাজহংসশ্রেণী আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তরবায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা,
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে। প্রান্তরসীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউকথাকও। গ্রামপথ আঁকাবাঁকা
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিতধূলি অকস্মাৎ পবন-উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা।

২

ভরেছ, হেমন্তলক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্ক ধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে। বলেছিল ডাকি,
'কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিবে না কি।
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার-পানে।' শুনিয়া, লুকায়ে হাস্যখানি,

বনবাণী

লুকায়ে দক্ষিণহস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি—
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃতনৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়বাণীরে।

দেব্‌তারা আজ আছে চেয়ে—
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে,
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার, দিন ফুরালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে।

শীতের উদ্‌বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু !
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলিছায়ে হল বিলীন,
পরান মন হিমে মলিন
আড়াল তারে ঘেরি—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী।

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী।
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।
কাঁদিয়া কয় কাননভূমি,
'কী আছে মোর, কী চাহ তুমি।
শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি,
কাঁপাও থরথর—
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।'

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা—
তুলিছ ধ্বনি' কী আগমনী আজি যাবার বেলা।
যৌবনেরে তুষারডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে,
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে
কুয়াশাঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

নটরাজ

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খান্‌খান্‌,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ।
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,
শঙ্খ কহে হুহুংকারি,
'বাঁধন সে তো মায়া,
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া।'

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরই জয়—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে—
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
ঢাকিয়া তারে আঁধার-মাঝে,
নিশীথনাচে ডমরু বাজে,
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।

বনবাণী

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা—
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্যলোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা।

আসন্ন শীত

গান

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আম্‌লকি-ডাল সাজল কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চলে।

সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচালো
ঝুমকো লতা।
উত্তরবায় জানায় শাসন,
পাতল তপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কার
অট্টরোলে।

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থরথর কম্পমান, শীর্ষ করি নত
আদেশনির্ঘোষ তব মানে। 'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো' এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব
করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকালপুষ্পের দুঃসাহস।

হে নির্মল,
সংশয়-উদ্‌বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি দাও মন; সর্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মুরতি
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনাভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি

নটরাজ

লেখে আসি, সে শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেইমতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্রহস্তে ; কুজ্ঝটিকারাশি
রাখুক পুঞ্জিত করি প্রসন্নের হাসি।
বাজুক তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার ; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো ; হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ। হে নির্মম,
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নম।

নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আম্‌লকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শির্‌শিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।
উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।

শূন্য করে ভরে-দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে
সারা বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন্ কোন্ সকালে।

শীতের প্রবেশ

গান

নমো নমো, নমো নমো।
নির্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্মম,
যা-কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম।

—

সর্বনাশার নিশ্বাসবায়
লাগল ভালে;
নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণতালে।
করব বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক ছিঁড়ে মোর বন্ধনডোর
যাবার কালে।
ভয় যেন মোর হয় খান্‌খান্‌
ভয়েরই ঘায়ে,
ভরে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন দুলাই,
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,
নির্মল হব পথের ধুলাই
লাগিলে পায়ে।

বনবাণী

শীত, যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে,
সেই নিমেষেই যাব নির্বাক্
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি—
শুকনো গোলাপ, ঝরা যূথী জাতী,
নির্জন পথে হোক মোর সাথি
অন্ধকারে।

জানি জানি, শীত, আমার যে গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে।
দক্ষিণবায়ে করে যাব দান,
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে।

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া লবে,
জেনো বারে বারে ফিরে ফিরে তারে
ফিরাতে হবে।
যা-কিছু ধুলায় চাহিবে চুকাতে
ধুলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে।

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য।
কুন্দমালতী করিছে মিনতি,
হও প্রসন্ন।
যাহা-কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ,
হও প্রসন্ন।

সাজাবে কি ডালা, গাঁথিবে কি মালা
মরণসত্রে।
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র, এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য,
হও প্রসন্ন।

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে,
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার—
হেলায় যে জন ফেলায় সকল তার
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে।

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাতচিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।
এতদিন তুমি বনের মজ্জা-মাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহুকাল ভয় মানি
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি
বিচিত্র কোলাহলে।

নটরাজ

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ ফিরে এসে
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি
তার বহুগুণ ও যে দিতে চায় ভরি,
পল্লবে যার ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি
ফুল পাবে সেই লতা।

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্যে তারি হল আজি অধিকার।
দক্ষিণবায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধনসিদ্ধ যে জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রসভারে তাই হবে না তাহার হানি—
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি,
দৈন্য পুরিবে দানে।

বসন্তের প্রবেশ

গান

নমো নমো, নমো নমো।
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ—
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

—

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হয়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা,
আপনি করিলে পূর্ণ।
ভরেছে পূজার সাজি,
গান উঠিয়াছে বাজি,
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।

একি লীলা, হে বসন্ত।
ম্লান আবরণ-আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান,
এসেছ তাহারি জন্য।

নটরাজ

পথে পথে দিলে পরশের দান,
ধূলিরে করিলে ধন্য।
যেথা আস তুমি, বীর,
জাগে তব মন্দির—
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ,
স্তব করে মহারণ্য।
একি লীলা, হে বসন্ত।
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি একি দৃশ্য—
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তব পুষ্পিত তরু
জয় করি নিল মরু—
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হল তব শিষ্য।
একি লীলা, হে বসন্ত।
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তিবিহীন
করিলে প্রজ্জ্বলন্ত।

আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়
কাননবীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ করে তায় গেল চলি—
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরলগীতি
হে অতিথি।

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশি
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি
দাও-না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে—
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি
হে অতিথি।

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্তে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নববরবেশে।
তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ—
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

সূর্য প্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা।

আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্যহোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে
রক্তিম আগুনে।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি,
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী—
বনে জাগে গান।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকালতরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যাস্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার।
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজালবলে
কর অলংকার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্তে দোলে ছন্দভরে ;
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম বাণীর মানসসরোবরে ;
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

নটরাজ

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্তে, হে মর্তের প্রিয়,
নিত্য নাই হলে।
সুদূরমাধুর্য-পানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে—
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দাররেণু শিরে তার উর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাস-রসে ভরা
রবে তার কোলে।

রাগরঙ্গ

গান

রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা সে ভাবে-ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে।

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগল সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে
শেষ বেলাকার গান রে।
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায়রাতি করবে মধুর,
মাতল আজি অস্তসাগর
সুরের প্লাবনে।

বসন্তের বিদায়

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা—
জানি আমি জানি, সে তব মধুর
ছলের খেলা।
জানি গো বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে—
জানি, তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন-মেলা।

জানি আমি, যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চদান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি—
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায়লগনে ধরিয়া তুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বারবার
'ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার'
বাষ্পবিভল বাণী।

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস প্রিয়!
বনপথে যবে যাবে সে খনের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের—
তুলি লব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি।

অহৈতুক

গান

মনে রবে কি না রবে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
খনে খনে আসি তব দুয়ারে,
অকারণে গান গাই গো।
চলে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো।
তাই অকারণে গান গাই গো।

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া,
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ ;
গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন ;
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারই ভেলাটাই গো।
তাই অকারণে গান গাই গো।

মনের মানুষ

[১]কত-না দিনের দেখা
কত-না রূপের মাঝে—
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।

কার নয়নের চাওয়া
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে।

কত ফাগুনের দিনে
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।

চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা—
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া।

শরতে এসেছে ভোরে
ফুলসাজি হাতে করে,

১ এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে। ইহার যতিবিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :
কত-না দিনের। দেখা। কত-না রূপের। মাঝে।
সে কার বিহনে। একা। মন লাগে নাই। কাজে।

নটরাজ

শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপশিখা।

কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে—
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা।

সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া—

আজ এক হয়ে তারা
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণারূপ ধরি
এক গানে ফেলে ছায়া।

নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তারে হল জানা,
বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম—

আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম।

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে।
অস্তরবির তূলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা-ফুলরেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে।

যে গুণী তাহার কীর্তি-নাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে,
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে।

উৎসব

সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ, জাগিল ঐ, জাগিল।
হাস্যভরা দখিনবায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি— ভাগিল কোথা ভাগিল।
মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,
মদির রাগ লাগিল তারে—
হৃদয়ে তার লাগিল।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।
রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।

এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের-দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

বনবাণী

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল ;
অরুণবীণা যে সুর দিল রনিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

শেষের রঙ

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে,
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণদোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নির্ঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে—
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

দোল

আলোকরসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে,
ছড়ায় ফুলরেণু।
অমলরুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে-চরা ধেনু।

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতীপুরে ?
বাজায় বেণু বুকের কাছে,
বাজায় বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু 'বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে'।

গগনে শুনি একি এ কথা,
কাননে কী যে দেখি !
এ কি মিলনচঞ্চলতা
বিরহব্যথা এ কি !

নটরাজ

আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে।
ধরিতে যারে না পারে তারে
স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে—
সোহাগিনীর হৃদয়তলে,
বিরহিণীর মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিলহিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এসো গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক বয়ে।

এসো গো এসো দোলবিলাসী,
বাণীতে মোর দোলো—

বনবাণী

ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হল।

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙিন তব রাগে।
ভাবনাগুলি বাঁধন-খোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি-আগে।

—

বর্ষামঙ্গল

ও

বৃক্ষরোপণ-উৎসব

বর্ষামঙ্গল

গান

নীল অঞ্জনঘন-পুঞ্জছায়ায় সম্‌বৃত অম্বর,
হে গম্ভীর।
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝংকৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর।
বর্ষণগীত হল মুখরিত মেঘমন্দ্রিত ছন্দে,
কদম্ববন গভীর মগন আনন্দঘন গন্ধে—
নন্দিত তব উৎসবমন্দির,
হে গম্ভীর।

দহনশয়নে তপ্ত ধরণী পড়েছিল পিপাসার্তা,
পাঠালে তাহারে ইন্দ্রলোকের অমৃতবারির বার্তা।
মাটির কঠিন বাধা হল ক্ষীণ,
দিকে দিকে হল দীর্ণ,
নব-অঙ্কুর-জয়পতাকায় ধরাতল সমাকীর্ণ—
ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর,
হে গম্ভীর।

বৃক্ষরোপণ

গান

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি
এসো, শ্যামসুন্দর—
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথি,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

গান

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে—
চল্, আমাদের ঘরে চল্।
শ্যামবঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ-কোলাহল।

তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে
মর্মরগীত-উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চিরসখ্যে।
অন্তরে পাক্ কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষীসমাজে পাঠাক্ পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ্

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা-অভিষেকে।

তেজ

সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক—
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হোক।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা,
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি
হোক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি।

মরুৎ

হে পবন, কর নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা॥

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের সৃষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামল মূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীল বর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরু-তরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য॥

বৃক্ষরোপণ

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক, হে শিশু-চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক্ সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়।
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—

থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়,
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।

শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হোক্ মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে॥

বর্ষামঙ্গল

গান

আহ্বান আসিল মহোৎসবে
অম্বরে গম্ভীর ভেরীরবে।
পূর্ববায়ু চলে ডেকে
শ্যামলের অভিষেকে,
অরণ্যে অরণ্যে নৃত্য হবে।

নির্ঝরকল্লোলকলকলে
ধরণীর আনন্দ উচ্ছলে।
শ্রাবণের বীণাপাণি
মিলালো বর্ষণবাণী
কদম্বের পল্লবে পল্লবে।

গান

কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে
ছুটেছে মন মাটির পানে।
চোখ ডুবে যায় নবীন ঘাসে,
ভাব্না ভাসে পুব বাতাসে,
মল্লারগান প্লাবন জাগায়
মনের মধ্যে শ্রাবণগানে।

লাগল যে-দোল বনের মাঝে
অঙ্গে সে মোর দেয় দোলা-যে।
যে বাণী ঐ ধানের খেতে
আকুল হল অঙ্কুরেতে,
আজ এই মেঘের শ্যামল মায়ায়
সেই বাণী মোর সুরে আনে।

গান

আজ শ্রাবণের আমন্ত্রণে
  দুয়ার কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
ঘরের বাঁধন যায় বুঝি আজ টুটে।
  ধরিত্রী তাঁর অঙ্গনেতে
  নাচের তালে ওঠেন মেতে,
চঞ্চল তাঁর অঞ্চল যায় লুটে।

প্রথম যুগের বচন শুনি মনে
নবশ্যামল প্রাণের নিকেতনে।
  পুব হাওয়া ধায় আকাশতলে,
  তার সাথে মোর ভাব্‌না চলে
কালহারা কোন্ কালের পানে ছুটে।

গান

ঝড় নেবে আয়, আয় রে আমার
　　　　শুকনো পাতার ডালে
এই বরষায় নবশ্যামের
　　　　আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
　　　　যা আনন্দহারা
চরম রাতের অশ্রুধারায়
　　　　আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে
　　　　রুদ্রনাচের তালে।
আসন আমায় পাততে হবে
　　　　রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
　　　　সিক্ত বুকের 'পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে,
　　　　কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী,
　　　　ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি
　　　　মরণ-অন্তরালে।

—

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিক্‌প্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে,
সরোবরতীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয়বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।

নগরে গ্রামে কাননে,
দিনে নিশীথে,
পিকসংগীতে, নৃত্যগীতকলনে
বিশ্ব আনন্দিত—
ভবনে ভবনে
বীণাতান রণ-রণ ঝংকৃত।

মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়ে রে
নবপ্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি উন্মাদনা
ঝন-ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে॥

শুনেছ অলিমালা, ওরা ধিক্কার দিচ্ছে ওই ও পাড়ার মল্লের দল; তোমাদের চাপল্য তাদের ভালো লাগছে না। শৈবালগুচ্ছবিলম্বী ভারী ভারী সব কালো কালো পাথরগুলোর মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা গুহাদ্বারে ভ্রূকুটি পুঞ্জিত করে বসে আছে। কলহাস্যচঞ্চলা নির্ঝরিণী ওদের নিষেধ লঙ্ঘন করেই বেরিয়ে পড়ুক এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দ-প্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে— চূর্ণ

বনবাণী

চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের অঞ্জলিবিক্ষেপে ছড়িয়ে ছড়িয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে সেটা ও পাড়ার শাস্ত্রবচনের বেড়া এড়িয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা, যে রসরাজের নিমন্ত্রণে এসেছ তাঁর প্রসন্নতা যেমন আজ নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে ওই অন্তঃস্মিত গন্ধরাজ মুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে, তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে.। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁরই চরণে তোমাদের নৃত্যের নৈবেদ্য আজ নির্ঝরিত করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা,
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা
উষার শুকতারা
কনকচাঁপা কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা।
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা।

—

তুমি সুন্দর যৌবনঘন
রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয়পরিপূর্তি।

নবীন

নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ
মরণহীন চিরনবীন
তব মহিমাস্ফূর্তি ॥

ও দিকে আধুনিক আমলের বারোয়ারির দল বলছে, উৎসবে নতুন কিছু চাই। কোণা-কাটা ত্যাড়াবাঁকা. দুম্‌দাম্‌-করা কড়া-ফ্যাশানের আহেলা বেলাতি নতুনকে না হলে তাদের শুকনো মেজাজে জোর পৌঁচচ্ছে না। কিন্তু যাঁদের রসবেদনা আছে তাঁরা কানে কানে বলে গেলেন, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। এঁরা বলেন, মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসংকোচে বারে বারে রঙিন। চির-পুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' সেই নিত্যনন্দিত সহজশোভন নবীনের উদ্দেশে তোমাদের আত্মনিবেদনের গান শুরু করে দাও।

আন্‌ গো তোরা কার কী আছে,
দেবার হাওয়া বইল দিকে দিগন্তরে—
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে,
পলাশকানন ধৈর্য হারায় রঙের ঝড়ে,
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে।

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে,
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস-'পরে।
দখিনহাওয়া হেঁকে বেড়ায় 'জাগো জাগো'—

বনবাণী

দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্তরঙের জাগল প্রলাপ অশোক গাছে ॥

আজ বরবর্ণিনী অশোকমঞ্জরী তার চেলাঞ্চল-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশে রক্তরঙের কিঙ্কিণীঝংকার বিকীর্ণ করে দিলে; কুঞ্জবনের শিরীষবীথিকায় আজ সৌরভের অপরিমেয় দাক্ষিণ্য। ললিতিকা, আমরাও তো শূন্য হাতে আসি নি। মাধুর্যের অতল সমুদ্রে আজ দানের জোয়ার লেগেছে, আমরাও ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই তরীর রসি খসিয়ে দিয়েছি। যে নাচের তরঙ্গে তারা ভেসে পড়ল সেই নাচের ছন্দটা, কিশোর, দেখিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
করেছি-যে দান
আমার আপন-হারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ।
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রঙ লাগল আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউয়ের দোলে
মর্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান।

পূর্ণিমাসন্ধ্যায়
তোমার রজনীগন্ধায়
রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।
তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙিন-স্বপন মাখা।
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখসুখের সকল অবসান ॥

নবীন

ভরে দাও, একেবারে ভরে দাও গো, 'প্যালা ভর ভর লায়ী রে।' পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা। ঝর্নার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিক-পানে। এই ধারার মাঝখানে শেষে বিচ্ছেদ নেই। অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। আমাদের গানেও সেই আবৃত্তি, কেননা, গান তো আমরা শুধুকেবল গাই নে, গান যে আমরা দিই। তাই গান আমরা পাই।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চলে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা, গাইবি বলে।

কমলবরন গগন-মাঝে
কমলচরণ ঐ বিরাজে।
ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক,
নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক,
ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে॥

মধুরিমা, দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ওই কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হয়ে পড়েছে ওই আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

বনবাণী

নিবিড় অমা-তিমির হতে
বাহির হল জোয়ারস্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরাকুলে
আলোর মালা চামেলিবরণী—
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।

তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।

উৎসবের পশরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী—
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী॥

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন, আর-এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু, ওই-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে, তার শিকল নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ এক দিনের মতো ঘর-ছাড়া করো।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্,
লাগল-যে দোল।

নবীন

স্থলে জলে বনতলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

বেণুবন মর্মরে দখিনবাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা,
পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা,
মাধবীবিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

—

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।
যে জন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

সর্বনাশের ব্রত যাদের তাদের ভয় ভাঙিয়ে দাও। কারো কারো যে দ্বিধা ঘোচে না। ওই দেখো-না পাতার আড়ালে মাধবী। ওই অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। শুনছ না, বকুলগুলো ঝরতে ঝরতে বলছে

বনবাণী

'যা হয় তা হোক গে', আমের মুকুল বলে উঠছে 'কিছু হাতে রাখব না'। যারা কৃপণতা করবে তাদের সময় বয়ে যাবে।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি।

কখন্ দখিন হতে কে দিল দুয়ার ঠেলি,
চমকি উঠিল জাগি চামেলি নয়ন মেলি।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি উঠে দূর হতে কারে দেখি॥

—

তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে, সুপ্ত রাতে
আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে॥

নন্দিনী, ওই দেখে নাও শিশুর লীলা, ওই-যে কচি কিশলয়—

শ্যামল কোমল চিকন রূপের নবীন শোভা— দেখে যা—
কল-উতরোল চঞ্চলদোল ঐ যে বোবা॥

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

নবীন

ওরা অকারণে চঞ্চল।

ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে

নবপল্লবদল।

ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো

দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো;

মর্মরতানে প্রাণে ওরা আনে

কৈশোরকোলাহল।

ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে

নীরবের কানাকানি,

নীলিমার কোন্ বাণী।

ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছল ধার

ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,

চিরতাপসিনী ধরণীর ওরা

শ্যামশিখা হোমানল॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। কিন্তু, ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়— তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়। তাই আজ পথকেই প্রণাম।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার

করুণ রঙিন পথ।

এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর

দুয়ারে লেগেছে রথ।

বনবাণী

সে-যে সাগরপারের বাণী
মোর পরানে দিয়েছে আনি,
তার আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্বত।

দুঃখসুখের এ পারে ও পারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রুসলিলে
ভরে যায় দু'নয়ন।
ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি, পুন নিয়ে যাবে টানি
তারে, চিরদিন মোর যে দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ॥

—

বাতাসের চলার পথে
যে মুকুল পড়ে ঝ'রে
তা নিয়ে তোমার লাগি
রেখেছি ডালি ভ'রে।

টুকরো টুকরো সুখদুঃখের মালা গাঁথব—সাতনরী হার পরাব তোমাকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি চুনে নিয়ে। ফাগুনের ভরা সাজির উদ্‌বৃত্ত থেকে তুলে নেব বনের মর্মর, বাণীর সূত্রে গেঁথে বেঁধে দেব তোমার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার দেওয়া ভূষণ প'রেই তুমি আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে তোমার দক্ষিণ হাতে।

নবীন

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তারে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে।

মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে॥

দ্বিতীয় পর্ব

কেন ধরে রাখা, ও-যে যাবে চলে
মিলনলগন গত হলে।
স্বপনশেষে নয়ন মেলো,
নিবু-নিবু দীপ নিবায়ে ফেলো,
কী হবে শুকানো ফুলদলে।

এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো শিরীষবনের পুষ্পাঞ্জলি উঠছে ভরে ভরে, তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। বিদায়দিনের প্রথম হাওয়া অশথগাছের পাতায় পাতায় ঝর্ ঝর্ করে উঠছে। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, দিগন্তে পথের একতারায় সুর বাঁধা হচ্ছে— মনে হচ্ছে, যেন বসন্তী রঙ ম্লান হয়ে গেরুয়া রঙে নামল।

চলে যায়, মরি হায়, বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীরভরে
উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরই তাপে,
মধুকরগুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরানে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

নবীন

বিদায় দিয়ো মোরে প্রসন্ন আলোকে,
রাতের কালো আঁধার যেন নামে না ঐ চোখে ॥

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটি মঞ্জুর হল। তার প্রণাম তুমি নাও। তার আপন গানের বন্ধনেই চির-দিন সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে। তার সুরের রাখী তুমি গ্রহণ করেছ আমি জানি ; তার পরিচয় রইল তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাত-কম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক ;
যায় যদি সে যাক।
রইল তাহার বাণী, রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে ;
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্বাক্।

ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।
তারে তোমার বীণা
যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তার থাক্ ॥

—

তবে শেষ করে দাও শেষ গান,
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলো না গো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে ॥

এর ভয় হয়েছে সব কথা বলা হল না। এ দিকে বসন্তের পালা সাঙ্গ হল। ত্বরা কর্ গো ত্বরা কর্— বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে অঞ্জলি পূর্ণ করে দে— তার পরে আছে করুণ ধূলি তার আঁচল বিছিয়ে।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি
তোমায় লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি।
তখনো কুহেলিজালে,
সখা, তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণমালিকা
উঠিতেছে ছলছলি।

এখনো বনের গান,
বন্ধু, হয় নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি।
ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরোঝরো হল, এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস বলি॥

'শুক্‌নো পাতা কে যে ছড়ায় ঐ দূরে।' বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, আজ তারা যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর।'

নবীন

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।

ঝরা পাতা গো, বসন্তী রঙ দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধুলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।
তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙিন করি,
অস্তরবি লাগাক পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে॥

—

সে-যে কাছে এসে চলে গেল তবু জাগি নি।
কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী॥

মন ছিল সুপ্ত, কিন্তু দ্বার ছিল খোলা, সেইখান দিয়ে কার নিঃশব্দ চরণের আনাগোনা। জেগে উঠে দেখি, ভুঁইচাঁপাফুলের ছিন্ন পাপড়ি লুটিয়ে আছে তার যাওয়ার পথে। আর দেখি, ললাটে পরিয়ে দিয়ে গেছে বরণমালা, তার শেষ দান, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণমালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে—
অরুণ মেঘে
বিদায়বাঁশরি বাজে অশ্রু-গালা।

বনবাণী

গোপনে এসে গেলে,
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখডোরে
বাঁধিলে মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহবেদন-ঢালা॥

হে বনস্পতি শাল, অবসানের অবসাদকে তুমি দূর করে দিলে। তোমার অক্লান্ত মঞ্জরীর মধ্যে উৎসবের শেষবেলাকার ঐশ্বর্য, নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস বিচ্ছেদের সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়ালো।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল,
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শাল,
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি,
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি,
সব-অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

এইবার শেষ দেওয়া-নেওয়া চুকিয়ে দাও। দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, উত্তরীয়ের সুগন্ধ, বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও আমার অন্তরের বেদনা নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো—

নবীন

ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্মরমুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হতে বেদনে—
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন,
যে বাণী নীরব্‌ নয়নে॥

দূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে গেল পথিক। এমনি করেই বারে বারে সে কাছের বন্ধন আলগা করে দেয়। একটা অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বলে দিয়ে যায় কানে কানে, সাহসের স্বর এসে পৌঁছয় বিচ্ছেদ-সমুদ্রের পরপার থেকে— মন উদাস হয়ে যায়।

বাজে করুণ সুরে,
হায় দূরে,
তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থচিত চঞ্চল
জানি না কী উদ্দেশে।

যূথীগন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

—

বসন্ত-উৎসব

এ বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনো শিমুল তার শেষ মধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঞ্চনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবীর মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবীরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল বনস্পতি
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্যোগরাতে
জয়গৌরবে ঊর্ধ্বে তুলিলে শির,
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
সুরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

বনবাণী

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে
তরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল কর,
নববর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরি-ভরা সুন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি।

গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান—
লহো আমাদের গান।

শান্তিনিকেতন
দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮

—

বনবাণী ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। বনবাণী, নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা, বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব, নবীন— কাব্যখানি এই চারি অংশে বিভক্ত ছিল; বর্তমান সংস্করণের সর্বশেষে 'বসন্ত-উৎসব' নূতন সংযোজিত হইল। মূল পাণ্ডুলিপি, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন পাঠ এবং প্রথম মুদ্রণ মিলাইয়া বর্তমান মুদ্রণে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও রচনার স্থান কাল -সম্বন্ধীয় তথ্য সংযোজন করা হইল। বনবাণীর বিভিন্ন অংশের রচনা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি তথ্য নিম্নে সংকলিত হইল।

বনবাণী

'শাল' কবিতার ভূমিকায় এবং প্রথম স্তবকের শেষভাগে 'কিশোর কবিবন্ধু' ও 'কিশোর বন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় (বাংলা : মাঘ ১২৮৮ - মাঘী পূর্ণিমা ১৩১০)। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ইতিহাসের সহিত তাঁহার অচিরায়ু জীবনের ইতিহাস জড়িত, ইহা রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাতেই আভাসিত হইয়াছে।

'কুটিরবাসী' কবিতার ভূমিকায় 'তরুবিলাসী' 'তরুণ বন্ধু' বিশেষণে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।[১] পাণ্ডুলিপিতে এই কবিতার আরম্ভে অতিরিক্ত তিনটি স্তবক দেখা যায়—

> বাসাটি বেঁধে আছ মুক্তদ্বারে
> বটের ছায়াটিতে পথের ধারে।
> সমুখ দিয়ে যাই— মনেতে ভাবি,
> তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি,

১ বনবাণী কাব্যের ভূমিকাটি শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনকে লেখা একখানি পত্রের পরিমার্জিত রূপ। দ্রষ্টব্য : 'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা', প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৩৪।

হারায়ে ফেলেছি সে ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা পথিকজনা
আপনি এসে বসে অন্যমনা
তাহার বসা সেও চলারই তালে,
তাহার আনাগোনা সহজ চালে।
আসন লঘু তার, অল্প বোঝা—
সোজা সে চলে আসে, যায় সে সোজা।

আমি যে ফাঁদি ভিত বিরাম ভুলি,
চূড়ার 'পরে চূড়া আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনার জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে—
সে জালে আপনারে জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার হারাই শেষে।

নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা

'নটরাজ-ঋতুরঙ্গশালা' ১৩৩৩ সালে রচিত ও শান্তিনিকেতন আশ্রমে প্রথম অভিনীত হয়। উহাই ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে 'বিচিত্রা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা কলিকাতায় ইহার পুনরভিনয় হয়; তখন উহার নাম দেওয়া হয় 'ঋতুরঙ্গ'। অভিনয়পত্রীতে দেখা যায়, 'বিচিত্রা'য় মুদ্রিত পাঠের উপর অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে, অনেক নূতন রচনা যোগ করা হইয়াছে। প্রধানতঃ সেই পাঠই ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসে 'মাসিক বসুমতী'তে 'ঋতুরঙ্গ' নামে মুদ্রিত।

বর্তমান গ্রন্থের পাঠ-প্রণয়ন-কালে কবি 'বিচিত্রা' ও 'মাসিক বসুমতী' উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি বিভিন্ন পাঠের নূতন এক সমন্বয় করিয়াছেন, সন্নিবেশক্রমেও বহু পরিবর্তন হইয়াছে।

বিচিত্রায় যে কবিতা ও গীতগুচ্ছ প্রকাশিত হয় তাহার রচনা প্রধানতঃ ১৩৩৩ সালের বসন্তঋতুতে। মাসিক বসুমতীতে প্রকাশকালে যে নূতন রচনাগুচ্ছ যোগ করা হয়, তাহার অধিকাংশই ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে রচিত। নটরাজ কাব্যের বিভিন্ন রচনার সন্নিবেশে একমাত্র ভাবানুষঙ্গই অনুসৃত হইয়াছে, রচনাকাল দেখা হয় নাই। রচনাগুলির সন্নিবেশক্রম অনুসরণ করিয়া উহাদের রচনার কাল নিম্নে দেওয়া গেল।[১] কতকগুলি রচনার তারিখ জানা যায় নাই।—

মুক্তিতত্ত্ব। খসড়া : ১ চৈত্র [১৩৩৩]
উদ্‌বোধন। খসড়া : [২-৩ চৈত্র ১৩৩৩]
নৃত্য। মূল কবিতা[২] : [২১-২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩]
বৈশাখ। খসড়া : ১ চৈত্র [১৩৩৩]
বৈশাখ-আবাহন। প্রায় গ্রন্থের পাঠ : ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
কালবৈশাখী। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
মাধুরীর ধ্যান। ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
ব্যঞ্জনা। খসড়া : ১ চৈত্র [১৩৩৩]
আষাঢ়। ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
লীলা। ১৫ ফাল্গুন ১৩৩৩
বর্ষামঙ্গল। খসড়া : ১ চৈত্র [১৩৩৩]
যায় রে শ্রাবণকবি। ২ চৈত্র [১৩৩৩]
শেষ মিনতি। মূল গান : ১৪ ফাল্গুন ১৩৩৩
শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শরৎ। ১ চৈত্র [১৩৩৩]
শান্তি। প্রায় গ্রন্থের পাঠ : ২ চৈত্র [১৩৩৩]

১ বন্ধনীমধ্যে পরোক্ষপ্রমাণসিদ্ধ সময়ের উল্লেখ করা হইল। ২-৩ তারিখ=২ বা ৩ তারিখ। ২১-২৫ তারিখ=২১ হইতে ২৫ তারিখের অন্তর্বর্তী কোনো সময়।

২ বিচিত্রার পাঠ। নতিবাচক ধুয়া অংশটি নাই।

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা। ১৩ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]
শরতের ধ্যান। মূল গান : ১৬ ফাল্গুন ১৩৩৩
শরতের বিদায়। খসড়া : ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শিউলি ফুল, শিউলি ফুল। [২১-২৫ ফাল্গুন ১৩৩৩]
বিলাপ। বিচিত্রার পাঠ : ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
পরিবর্তন : [অগ্রহায়ণ ১৩৩৪]
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার। ১৭ ফাল্গুন ১৩৩৩
হেমন্ত। [২৯ ফাল্গুন - ১ চৈত্র ১৩৩৩]
দীপালি। [২৫-২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩]
শীতের উদ্‌বোধন। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
আসন্ন শীত। [চৈত্র ১৩৩৩ - ৭ বৈশাখ ১৩৩৪]
শীত। খসড়া : [২৯ ফাল্গুন - ১ চৈত্র ১৩৩৩]
সর্বনাশার নিশ্বাসবায়। ১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
স্তব। ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
শীতের বিদায়। খসড়া : [৩-৯ চৈত্র ১৩৩৩]
লুকানো রহে না বিপুল মহিমা। ১৪ অগ্রহায়ণ [১৩৩৪]
আবাহন। ১৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
বসন্ত। ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩
বসন্তের বিদায়। ২ চৈত্র [১৩৩৩]
প্রার্থনা। ২০ ফাল্গুন ১৩৩৩
অহৈতুক। ১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
মনের মানুষ। ৩ চৈত্র ১৩৩৩
চঞ্চল। বিভিন্ন খসড়া : ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩
উৎসব। খসড়া : ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪
শেষের রঙ। ২৯ ফাল্গুন ১৩৩৩
দোল[৩]। ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৩

৩ তুলনীয় গান : ওগো কিশোর আজি : গীতবিতান।

গ্রন্থপরিচয়

নটরাজ কাব্যে প্রাক্‌কালীন যে রচনাগুলি সংকলিত হইয়াছে তাহারও তালিকা দেওয়া গেল—

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার আভাস পেলে[১]
শিউলি-ফোটা ফুরালো যেই শীতের বনে
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন

নটরাজ কাব্যের কয়েকটি পাঠান্তর নিম্নে দেওয়া গেল।

॥ ১ ॥ শেষ মিনতি

কেন পান্থ, এ চঞ্চলতা,
শূন্য গগনে পাও কার বারতা।
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মত—
কুন্তলপুঞ্জ অযত্নে নত,
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা।
ধৈর্য ধরো, সখা, ধৈর্য ধরো—
দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর—
হেরো গন্ধনিবেদনবেদনসুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা।

—বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪

॥ ২ ॥ বিলাপ

আজি এ নূপুর তব যে পথে বাজিয়ে চল
চিহ্ন কেমনে তার আপনি ঘুচাবে বলো।

১ পুরাতন রচনার নূতন রূপ ; সুরও পৃথক।
তুলনীয় : শ্যামল ছায়া, নাই বা গেলে।
অথবা : শ্যামল শোভন শ্রাবণ, তুমি নাই বা গেলে।

—গীতাবিতান।

অশোকের রেণুগুলি
রাঙাইল যার ধূলি
সেখানে শিশিরে তৃণ করিবে কি ছলোছলো।
পাতা পড়ে, ফুল ঝরে, যায় ফাগুনের বেলা—
দখিনবাতাস যায় শেষ করি শেষ খেলা।
তার মাঝে অমৃত কি
ভরিয়া রহে না সখী।
স্বপনের মালা-সম তারো স্মৃতি টলোমলো।[১]

—পাণ্ডুলিপি

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি।
অশোকরেণুগুলি
রাঙালো যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি?
ফুরায় ফুল ফোটা, পাখিও গান ভোলে—
দখিনবায়ু সেও উদাসী যায় চলে।
তবু কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে।
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি।[১]

১৯ ফাল্গুন ১৩৩৩ —বিচিত্রা, আষাঢ় ১৩৩৪

॥ ৩ ॥ চঞ্চল

প্রজাপতি, আপন ভুলি ফিরিস ওরে
ফুলের দলে দুলি দুলি কিসের ঘোরে।
হাওয়ার বুকে যে চঞ্চলের গোপন বাসা
আকাশে তুই বয়ে বেড়াস তারি ভাষা—

১ রচনাকালে এবং বিচিত্রায় প্রকাশকালে বসন্তের গীতপর্যায়ে সন্নিবেশিত ছিল।

অপ্সরী তার ইন্দ্রসভার স্বপ্নগুলি
পাঠালো তোর পাখায় ভ'রে।
যে গুণী তার কীর্তিভাঙার খেলা খেলে,
চিকণ রঙের লিখন মুছে হেলায় ফেলে,
সুর বাঁধে আর সুর সে হারায় পলে পলে,
গানের ধারা ভোলা সুরের পথে চলে—
তারহারা-সুর নাচের তালে কোন্ সকালে
ডানাতে তোর পড়ল ঝ'রে।

২৭ ফাল্গুন ১৩৩৩ —পাণ্ডুলিপি

বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ-উৎসব

বৃক্ষরোপণ উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ সালে। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুরকে কবি এই উৎসবের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছিলেন—

এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন।... তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে, গান গাইতে গাইতে, গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন —আমি একে একে ছ'টা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে, চন্দন দিয়ে, ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল।... তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল— আমি এই উপলক্ষ্যে ছোটো একটি গল্প[১] লিখেছিলুম, সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুশি হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরি-দেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর। [৯ শ্রাবণ ১৩৩৫]

—চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্রসংখ্যা ২৮

১ বলাই : গল্পগুচ্ছ তৃতীয় খণ্ড।

এই অংশের কতকগুলি গীতিকবিতার রচনাকাল—

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়। ২৬ শ্রাবণ [১৩৩৬]
আয় আমাদের অঙ্গনে। শান্তিনিকেতন ২ শ্রাবণ ১৩৩৬
বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো। [জুলাই ১৯২৮]
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী। [জুলাই ১৯২৮]
সৃষ্টির প্রথমবাণী তুমি, হে আলোক। [জুলাই ১৯২৮]
হে পবন, কর নাই গৌণ। [জুলাই ১৯২৮]
আকাশ. তোমার সহাস উদার দৃষ্টি। [জুলাই ১৯২৮]
প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক। খসড়া : ১৩ জুলাই ১৯২৮
আহ্বান আসিল মহোৎসবে। শান্তিনিকেতন ১০ শ্রাবণ ১৩৩৬
কোন্ পুরাতন প্রাণের টানে। শান্তিনিকেতন ১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬
ঝড় নেবে আয়, আয় রে আমার। শান্তিনিকেতন ৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

নবীন

'নবীন' ১৩৩৭ ফাল্গুনে রচিত। চৈত্রমাসে কলিকাতায় উহার গীতাভিনয় উপলক্ষে উহা প্রথম পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বনবাণীতে গ্রহণের সময় কবি অনেকগুলি পুরাতন গান ও তৎপ্রাসঙ্গিক কথাবস্তু বর্জন করিয়া এবং অন্যান্য পরিবর্তন করিয়া উহাকে নূতন আকার দেন। উক্ত প্রথম পাঠ পরপৃষ্ঠা হইতে সংকলিত হইল। কিন্তু, যে গানগুলি বনবাণী গ্রন্থের অন্তর্গত বা কবির অন্য সুপ্রচলিত গ্রন্থে প্রকাশিত, সেগুলির প্রথম ছত্রই কেবল দেওয়া গেল। 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে'[১] গানের পাঠান্তর 'হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে' পুনর্মুদ্রিত হইল। 'বেদনা কী ভাষায় রে' কবিকর্তৃক বনবাণী-সংস্করণে বর্জিত হইলেও, প্রথম প্রকাশিত নবীনের অঙ্গীভূত নবরচিত গান হিসাবে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১ দ্রষ্টব্য : এই গ্রন্থের পৃ. ৭৪

নবীন

প্রথম পর্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী

শুনেছ, অলিমালা? ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্ছে, ঐ ও পাড়ার মল্লের দল— উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগছে না। শৈবাল-পুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করছে, নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে— চূর্ণ চূর্ণ সূর্যের আলো উদ্‌বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ করে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে অক্ষয় শৌর্যের অনুপ্রেরণা আছে সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চলে গেল। ভয় কোরো না তোমরা; যে রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেছ, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেছে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজমুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা

একটা ফর্মাশ এসেছে বসন্ত-উৎসবে নতুন কিছু চাই— কিন্তু, যাদের রসবেদনা আছে তারা বলছে, আমরা নতুন চাই নে, আমরা চাই নবীনকে। তারা বলে, মাধবী বছরে বছরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙিন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।' সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান শুরু করে দাও।

আন্ গো তোরা কার কী আছে

অশোকবনের রঙমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পঞ্চমরাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শূন্যহাতে আসি নি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই-তরী রসি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদের ভরা নৌকো দখিন-হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হল, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি-যে দান

ভরে দাও একেবারে ভরে দাও, কোথাও কিছু সংকোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝর্নার তার এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর-এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে— এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই— অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভরে দে গো উষার কোলে

মধুরিমা, দেখো, দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত। কত দিন ধরে এক তিথি থেকে আর-এক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভরে নিয়ে এল— কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে বসে আছে; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তার শুভ্র মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়ছে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগল।

নিবিড় অমা-তিমির হতে

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে— জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে— অন্তর থেকে বাহিরে, আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই

দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজায় আগল এঁটে বসেই রইল— হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্

কিন্তু, পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিতলোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে বসে উৎসবের মন্ত্র জপ করতে লাগল। ওকে দেখাচ্ছে যেন জ্যোৎস্নাসমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো— কিন্তু, সে ঢেউ-যে চিত্রার্পিতবৎ স্তব্ধ। এ দিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে পড়েছে ; চঞ্চলের দল মেতেছে বনের শাখায়, পাখির ডানায় ; আর, ঐ কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে, নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্। নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হল। এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে, চাঁদ, তোমায় দোলা[১]

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙনো চাই। ঐ মাধবীর দ্বিধা-যে ঘোচে না। এ দিকে আকাশে আকাশে প্রগল্ভতা, অথচ ওরা রইল সসংকোচে ছায়ার আড়ালে। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইল যে— বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বলছে, যা হয় তা হোক গে, আমের মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠছে, দিয়ে ফেলব একেবারে শেষ পর্যন্ত। যে পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েছে তার কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় করে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। কৃপণতা করে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠছে, তাকে পাব না তো কী! যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে পথে চলে সেখানে যে তার চলার রঙ লাগে। যে আড়ালে থাকে তার ফাঁক দিয়ে আসে তার মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকারে যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায়

হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে পারি নে সব অক্ষর, কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌছয়। লুকিয়েই ও ধরা দেবে, এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে, গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া[১]

এইবার বেড়া ভাঙল, দুর্বার বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিল বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝর্না ছুটে বেরোল, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। 'চরম যখন আসেন তখন এক-পা এক-পা পথ গুনে গুনে আসেন না। একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ করে আসেন।

হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
তোমার মোহন এল সোহন বেশে,
কুয়াসাভার গেল ভেসে—
এল তোমার সাধনধন উদার আশ্বাসে।
অরণ্যে তোর সুর ছিল না, বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন, পুষ্পবিহীন ধরা।
এবার জাগ্‌ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে—
বুঝি এল তোমার পথের সাথি উতল উচ্ছ্বাসে।

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েছে, চোখ খুলেছে। এইবার সময় হল চার দিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে, ঐ শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তার দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ঐ সূর্যের আলো; সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। ঐ তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্মরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল

আবার একবার চেয়ে দেখো— অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে,

আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ বলে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছ তাকে দেখে নাও তার আপন মহিমায়। ঐ দেখো ঐ বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি। সূর্যের আলো ওকে আপন ব'লে চেনে। দখিন-হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায়, কেমন আছ। তোমার গানে আজ ওকে গৌরব দিক। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাঁতাসে[১]

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার করেছে, মৌমাছির দল বন্দনা করে তার কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্ছে। সকলের আগেই উৎসবের সদাব্রতও শুরু করে দিয়েছিল, সকলের শেষ পর্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইল খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ করতে পারছে না— তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী[২]

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিল বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌঁছিয়ে দিলে। তারই সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠল সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু, আনন্দ করতে করতেই চোখে জল আসে-যে। ভুলব কেমন করে যে, যে পথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিঁড়ে নিজেও বেরিয়ে না পড়লে, ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাব কী করে। আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে; দেখা দেয় যদি-বা, তার পরেই সে দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার করুণ রঙিন পথ

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুকরো টুকরো সুখের হার গাঁথব— পরাব ওকে মাধুর্যের মুক্তোগুলি। ফাগুনের ভরা

সাজি থেকে যা-কিছু ঝরে ঝরে পড়ছে কুড়িয়ে নেব, বনের মর্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা— আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে, বেঁধে দেব তার মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আসবে। আমি থাকব না, কিন্তু কী জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাকবে ওর দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে

দ্বিতীয় পর্ব

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্মে মর্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে,
তব নন্দনবন-অঙ্গন-দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।

বিদায়দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠল। এখনো কোকিল ডাকছে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আম্রমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠল। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হচ্ছে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস, অবসানের গোধূলিছায়া নামছে।

চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন

হে সুন্দর, যে কবি তোমার অভিনন্দন করতে এসেছিল তার ছুটির দিন এল। তার প্রণাম তুমি নাও। যে গানগুলি এতদিন গ্রহণ করেছ সেই তার আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইল তোমার দ্বারে; তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন রয়ে গেল তোমার সাথের সাথি। তোমাকে

সে তার সুরের রাখী পরিয়েছে ; তার চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদপাতকম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

ওর ভয় হয়েছে, সব কথা বলা হল না বুঝি, এ দিকে বসন্তর পালা তো সাঙ্গ হয়ে এল। ওর মল্লিকাবনে এখনি তো পাপড়িগুলি সব পড়বে ঝরে, তখন বাণী পাবে কোথায়। ত্বরা কর্ গো, ত্বরা কর্। বাতাস তপ্ত হয়ে এল, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ করে দে ; তার পরে আছে করুণ ধূলি, তার আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি

সুন্দরের বীণার তারে কোমলগান্ধারে মিড় লেগেছে। আকাশের দীর্ঘনিশ্বাস বনে বনে হায়-হায় করে উঠল, পাতা পড়ছে ঝরে ঝরে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিল, তারাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম করতে লাগল বিদায়পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে ; বললে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক।

ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয় ; উত্তরীয়ের গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁইচাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগুলি লুটিয়ে থাকে তার যাওয়ার পথে ; তার বীণা থেকে বসন্তবাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকরগুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া ; কিন্তু, জানতে পাই নে, সে এসেছিল। জেগে উঠে দেখি, তার আকাশপারের মালা সে পরিয়ে গিয়েছে— কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন্ দিলে পরায়ে

বনবন্ধুর যাবার সময় হল, কিন্তু, হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার

অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল; বিষাদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে; বললে, 'পুনর্দর্শনায়।' তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল

দূরের ডাক এসেছে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে। তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক করে দেখাও। যে পথ তোমাকে নিয়ে আসে সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বঙ্কিম পথেই চিরদিন তোমার রথযাত্রা; যখন পিছন ফিরে চলে যাও সেই চলে-যাওয়ার ভঙ্গিটি আবার এসে মেলে সামনের দিকে ফিরে-আসায়, শেষ পর্যন্ত দেখতে পাই নে— হায়-হায় করি।

এখন আমার সময় হল[১]

বিদায়বেলায় অঞ্জলি যা শূন্য করে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্‌খানে সেই কথাটা শোনা যাক।

এ বেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে[১]

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হয়ে যাক। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের সুগন্ধ, তোমার বাঁশির গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন-খোলা। মরণে বাঁচনে হাতে হাতে ধরে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পুরোপুরি যোগ দাও; শুরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি করে চলে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়[১]

পথিক চলে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি করে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আলগা করে দেয়। একটা কোন্‌ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়; জানলায় বসে দেখতে পাই, তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজিনীলা দিগন্তরেখার ও পারে। বিচ্ছেদের ডাক শুনতে পাই কোন্‌ নীলিমকুহেলিকার প্রান্ত থেকে, উদাস হয়ে যায় মন— কিন্তু, সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।

বাজে করুণ সুরে, হায় দূরে

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার খেলা পুরো হল না— খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধুলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হালকা হয়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা[৩]

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক্‌ লীলা; সমে এসে সব তান মিলুক, শান্তি হোক্‌, মুক্তি হোক্‌।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক[১]

—

[শান্তিনিকেতন]
৩০ ফাল্গুন ১৩৩১

১ দ্রষ্টব্য : বসন্ত। ২ দ্রষ্টব্য : প্রবাহিণী বা দ্বিতীয় খণ্ড নবগীতিকা। ৩ দ্রষ্টব্য : ফাল্গুনী

প্রথম ছত্রের সূচী

কবিতা ॥ গান ॥ শ্লোক

প্রথম ছত্র

—